গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২২ - ২৮ এপ্রিল ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

নির্বাচন কমিশনের এই ভূমিকা নতুন নয়

নির্বাচন কমিশন যতটা গর্জালো, ততটা বর্ষালো কই? তৃতীয় দিনের নির্বাচনের পর প্রশ্নটা আরও জোরালো হয়ে উঠছে। নির্বাচনের এক মাস আগে থেকেই পাড়ায় পাড়ায় জওয়ানদের ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। চলছিল রুট মার্চ। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনাররাও আশ্বাসবাণী শুনিয়ে যাচ্ছিলেন, এবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন বিহারের মতোই শান্তিপূর্ণ হবে। রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় হোর্ডিংয়ে শোভা পাচ্ছিল 'নিজের ভোট নিজে দিন', 'নোটে নয়, ভোটে থাকুন' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যখন সময়কাল উপস্থিত হল তখন কী দেখা গেল? বাস্তবে কাউকেই দেখা গেল না। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ভোটের দিন ঘুমিয়ে কাটালেন। বোধহয় আগেই এত রুট মার্চ করেছিলেন যে, ভোটের দিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেককেই নাকি সেদিন পরিজনদের জন্য শপিং করতে দেখা গেছে। অর্থাৎ কমিশন যত গর্জাল, তার ভগ্নাংশও বর্ষাল না। দ্বিতীয় দিনের নির্বাচনে বহু জায়গাতেই বিরোধীদের এজেন্টরা বুথে ঢুকতে পারলেন না। কোথাও প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হল, কোথাও বিরোধী সমর্থকদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল, কোথাও আগের রাতেই প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধর করা হল। দিনের শেষে কমিশন ঘোষণা করল, নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ, কোথাও কোনও গোলমাল নেই। বিরোধীদের অভিযোগের চাপে পড়ে কমিশনের 'ফুল-বেঞ্চ' হাজির হয়ে কোথাও এক এস পি-কে, কোথাও কয়েক জন ওসিকে বদলির হুকুম দিলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে শো-কজ করলেন, তৃণমূলের এক জেলা নেতার উপর নজরদারির ফরমান দিয়ে সোজা দিল্লি উড়ে চলে গেলেন। তৃতীয় দফার নির্বাচনও ঠিক আগেরগুলির মতোই হল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, পরবর্তী নির্বাচনগুলিতেও কমিশনের আচরণ এবং ঘোষণায় ইতর বিশেষ হবে না।

নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ কি কোনও নতুন ঘটনা? অতীতে এ রাজ্যের মানুষ বারে বারে কমিশনের এমন ফাঁকা গর্জন শুনেছে, শেষ পর্যন্ত তাতে পর্বতের মুষিক প্রসব ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। ওপরে ওপরে যখন নির্বাচন কমিশনের গর্জন শোনা যায়, ভেতরে ভেতরে তখন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অদৃশ্য বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনের দিন কমিশনের ভূমিকাও অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু এ রাজ্য নয়, সারা দেশের নির্বাচনী চিত্র একই রকমের। নির্বাচন কমিশন কখনও তার স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা হিসেবে কাজ করেছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়নরা নির্বাচনকে পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার হিসাবে তুলে ধরে। অথচ বাস্তবে টাকার জোর, মিডিয়ার জোর, পেশিশক্তি নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভোটে জিতছে পুঁজিপতি শ্রেণির দলগুলি। অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর পার করে একচেটিয়া স্তরে আসার পর পুঁজিবাদ বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। পুঁজিপতিরা তাদের পছন্দের দুটি দল বা দুটি জোটকেই প্রচারে চায় এবং তাদের অর্থনির্ভর মিডিয়া প্রভুর ইচ্ছানুসারে সেই দুটি দলকেই প্রচারে আনে। অন্য দল বা প্রার্থীদের কোনও প্রচারই দেয় না। এইভাবে গণতন্ত্রকে কাটছাঁট করা হয়। তারপর যে নির্বাচন হয় সেখানেও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে গুন্ডাবাহিনী নামিয়ে বুথ দখল করে জনমতকে পদদলিত করে, জেতার কুস্তি চলে। এই ভাবে রিগিং, বুথ দখল, ছাপ্পা, গুন্ডাগিরি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নির্বাচনটা ধীরে ধীরে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে যখন একটা প্রহসনের চেহারা নিচ্ছে, তখন তার 'পবিত্রতা' ফিরিয়ে আনতে কমিশনার হিসেবে আসরে নামানো হয়েছিল ঝানু আমলা টি এন শেষনকে। কমিশনার হিসাবে তাঁর লম্ফঝম্ফ হাঁক-ডাক আজও অনেকের মনে আছে। তিনি ঘোষণা করলেন তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে নির্বাচন

ছয়ের পাতায় দেখুন

জলঙ্গি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রচার

মার্কিন যুদ্ধবিমানকে ভারতের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতির প্রতিবাদ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানকে ভারতের সামরিক ঘাঁটিতে রাখতে দেওয়া, জ্বালানি সরবরাহ, মেরামত করা, সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণ এবং অন্যান্যভাবে মার্কিন বাহিনীকে সাহায্যের যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সঙ্গে ভারতের সামরিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে গড়ে তোলার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক দেশে আক্রমণ করছে, যুদ্ধ বাধাচ্ছে। অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব হরণে সে সদা তৎপর। বিভিন্ন দেশে সামরিক শক্তির পেশি আস্ফালনের মাধ্যমে শাসক বদলাতে বাধ্য করছে এবং তাদের আধিপত্য বিস্তারের নীতি অনুসারে দুনিয়া জুড়ে সামরিক ঘাঁটি বানাচ্ছে। দখলদারি, লুঠের কারবার ও আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই অপচেষ্টা। সংবাদমাধ্যম থেকে আরও জানা গেছে সামরিক পরিবহণ ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে নীতিগত বোঝাপড়া হয়েছে। ২০০৪ সালে ইউ পি এ ১ সরকারের সময়েই এই প্রস্তাব এলেও বিরোধিতার ফলে তা আটকে গিয়েছিল। এন ডি এ সরকার মুখে যতই ভারতের মাটিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বানাতে দেওয়ার কথা অস্বীকার করুক না কেন, এটা স্পষ্ট, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নৌ প্রতিরক্ষা জোরদার করার অজুহাতে অদূর ভবিষ্যতেই এই ঘাঁটি হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়া ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়াকে আরও শক্তিশালী করছে।

শান্তিকামী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। এই সর্বনাশা প্রচেষ্টাকে রুখতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) ৩৩টি আসনে লড়ছে

১৪০ আসনের কেরালার বিধানসভা নির্বাচন ১৬ মে। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউ ডি এফ), সিপিএম নেতৃত্বাধীন লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এল ডি এফ), এস ইউ সি আই (সি) ও সহযোগী দুই বাম দলের লেফট ইউনাইটেড ফ্রন্ট (এল ইউ এফ) এবং বিজেপি। এস ইউ সি আই (সি) ছাড়াও লেফট ইউনাইটেড ফ্রন্টের অন্য দুই শরিক দল হল রেভলিউশনারি মার্কসিস্ট পার্টি (আরএমপি) ও মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (ইউনাইটেড)।

দক্ষিণপন্থী জোট ইউ ডি এফে এবার আর এস পি রয়েছে। আর এস পি এল ডি এফেই ছিল। আসন নিয়ে দ্বন্দ্বে সিপিএমের দাদাগিরির প্রতিবাদে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় ইউ ডি এফে যোগ দিয়েছে। এল ডি এফে সিপিএম, সিপিআই ছাড়াও জেডি-এস, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি, কেরল কংগ্রেস, কংগ্রেস (এস), জানথিপথি কেরল কংগ্রেস প্রভৃতি কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি রয়েছে। 'ইউ ডি এফের সঙ্গে জোটবদ্ধ মুসলিম লিগকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করেছে সিপিএম। কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি' (বর্তমান ০৮.০৪.১৬)। মুসলিম লিগ আরএসএসের মতোই একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি। গদির স্বার্থে সিপিএম তাকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। অতীতে মুসলিম লিগের কোনও

দুয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে ১ লাখ ৮ হাজার স্কুল বেসরকারিকরণ করছে বিজেপি সরকার

তীব্র বিক্ষোভ ডি এস ও-র

সংবাদ আটের পাতায়

কেরালা বিধানসভা নির্বাচন

একের পাতার পর

কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা বোঝাপড়া করেছে।

এই রাজ্যের নির্বাচনে একবার ইউ ডি এফ, একবার এল ডি এফ— এভাবেই পালাবদল ঘটেছে। অন্যান্য রাজ্যে এক দলের দীর্ঘশাসন যেমন সাধারণ মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা দূর করতে পারেনি, তেমনি এই রাজ্যে দুই জোটের পালাক্রমে শাসনও তা পারেনি। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে শাসন পরিচালিত হয়েছে, জনবিরোধী নীতি কার্যকর হয়েছে।

কংগ্রেস পরিচালিত ইউ ডি এফ শাসনে এল ডি এফের শাসনের মতোই জমি, নদী, সাগর, বন ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসা এবং মুনাফার জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পেট্রল-ডিজেলের দাম প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশি নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমলেও কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারও ট্যাক্স বসিয়ে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেরালার বাগিচা শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য রবার। কিন্তু তার দামের ধারাবাহিক পতন ছোট ছোট চাষি ও শ্রমিকদের গভীর সংকটে ফেলেছে। বাইরে থেকে প্রাকৃতিক ও সিন্থেটিক রবার আমদানি বন্ধ করলে চাষিদের বাঁচানো যেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এতে উদ্যোগ নেই। রাজ্য সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের কোনও রিলিফ দিচ্ছে না।

শিক্ষাগত মানে একসময় এই রাজ্য ছিল এক নম্বরে। সেই রাজ্যে স্কুল-পড়ুয়ারা এখন বুনিয়াদি ধারণা থেকে বঞ্চিত। পড়তে পারা, লিখতে জানা— যা প্রথম শ্রেণিতেই হয়ে যাওয়ার কথা, সেগুলো শেখানো হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণিতে। ১৯৯৪ সালের পর এল ডি এফ এবং ইউ ডি এফ— উভয় সরকারই বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করার ফলেই শিক্ষার মানের অধঃপতন ঘটেছে। খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। যারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, চাকরি না পেয়ে তাঁরা সেই ঋণও শোধ করতে পারছেন না। শিক্ষা-ঋণের ফাঁদ কেরালার মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের একটা ভয়াবহ সংকট হিসাবে দেখা দিয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাও একসময় কেরালায় উন্নত ছিল। এখন সব হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক-নার্স-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত ঘাটতি চূড়ান্ত। ওষুধ সহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামও পাওয়া যায় না। বেসরকারি হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে বহু পরিবার।

গত পাঁচ বছরে ইউ ডি এফ সরকার কয়েকবার বিদ্যুতের দাম এবং জলকর বাড়িয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। ব্যবসায়ী ও ফড়েদের সংগঠিত চক্র চাষিদের ফসল নামমাত্র দাম দিয়ে কিনে ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছে। সরকার কৃষিপণ্য কেনার বিকল্প ব্যবস্থা করেনি।

সরকারি উদ্যোগে কৃষিপণ্য ন্যায্য দামে কিনে সরকারি উদ্যোগে সুলভে বিক্রি করার ব্যবস্থা গড়ে তুললে মূল্যবৃদ্ধির কবল থেকে জনসাধারণকে কিছুটা বাঁচানো যেত। সরকার তাও করেনি। সমস্ত খুচরো ব্যবসা চলে যাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে। সবচেয়ে দুর্দশার মধ্যে পড়েছে শ্রমিক শ্রেণি। ক্ষোভে ফেটে পড়ছেও তারা। কিছুদিন আগে বাগিচা শ্রমিকরা, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবিতে ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়। বহু জায়গায় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিটুকুও শ্রমিকদের দেওয়া হয় না। শুধু বেসরকারি মালিকরাই না, এই না দেওয়ার তালিকায় সরকারও রয়েছে। সরকারের ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পেও ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে না।

পূর্বেকার সিপিএম পরিচালিত এল ডি এফ এবং বর্তমানের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ — কোনও সরকারেরই শ্রমজীবী জনগণের এইসব সমস্যা নিয়ে ন্যূনতম উদ্বেগটুকুও নেই। বিপরীতে পুঁজিপতিদের দাবি পূরণে তারা অত্যন্ত তৎপর।

ক্ষমতাসীন ইউ ডি এফের মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। বার ঘুষকাণ্ড, সোলার দুর্নীতি, ন্যাশনাল গেম দুর্নীতি, পত্তুর জমি দুর্নীতি, পাম অয়েল কেলেঙ্কারি সহ নানা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

ইউ ডি এফের জনবিরোধী নীতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এল ডি এফ কার্যকরী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ জনগণের কাছে এল ডি এফেরও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। কারণ ক্ষমতায় থাকার সময় এল ডি এফ যে সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছে তার সাথে কংগ্রেসের ইউ ডি এফের অনুসৃত নীতির কোনও পার্থক্য নেই। ঝান্ডায় এবং স্লোগানে পার্থক্য যাই থাকুক উভয়েরই শাসন প্রণালী বা নীতি মূলত এক। ফলে এল ডি এফ শাসন কেরালায় বামপন্থার স্বাতন্ত্র্য এবং মহত্ত্ব জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বুর্জোয়া নীতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে বামপন্থার মহত্ত্বকে অবনমিত করেছে।

জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে — 'যাহা ইউ ডি এফ তাহাই এল ডি এফ' মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে তৃতীয় বিকল্পের ভাবনা ক্রমাগত দানা বাঁধছে। বিজেপি এটাকে কাজে লাগিয়ে এই দক্ষিণী রাজ্যে শক্তি বাড়াতে চাইছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির 'আচ্ছে দিনের' প্রতিশ্রুতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দুই বছরের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতিগুলি তার এ প্রচেষ্টার সামনে বাধা হিসাবে কাজ করছে। একই সাথে বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও হানাহানির রাজনীতি জনসাধারণকে বিজেপির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে।

এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (সি) কেরালাতেও নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। রাজ্যের অন্য দুই বামপন্থী শক্তি আর এম পি এবং এম সি পি (ইউ)-র সাথে দু'বছর আগে এস ইউ সি আই (সি) যুক্ত হয়ে লেফট ইউনাইটেড ফ্রন্ট (এল ইউ এফ) গঠন করেছে। এই ফ্রন্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন-উদারিকরণের নীতির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবিক এই জোটই হল রাজ্যে প্রকৃত বামজোট।

রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে গণকমিটি গঠন করে সাধারণ মানুষের আন্দোলন রাজ্যে একটি নতুন ধারা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। বড় বড় এবং শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠছে। সে আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচার এবং সংসদীয় দলগুলির তরফে পিছন থেকে ছুরি মারা সত্ত্বেও গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জোর করে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোচি জেলায় মুলামপিল্লি আন্দোলন, খেতমজুরদের জমি দেওয়ার দাবিতে চেঙ্গারা আন্দোলন, রাস্তা সম্প্রসারণের নামে জোর করে জমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিলাপ্পিসালা গ্রামে বর্জ্য জমানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন— তার কয়েকটি উদাহরণ। এইসব আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষাঋণের ফাঁদে পড়া অভিভাবকরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। আন এডেড স্কুলের শিক্ষকরাও সংগঠিত হয়ে তাঁদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এই সব আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) প্রয়োজনীয় সাহায্য করে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ এস ইউ সি আই (সি) -কে চিনছে তার দরদি বন্ধু হিসাবে। বাড়ছে এস ইউ সি আই (সি)-র গণভিত্তি।

এই শক্তিকে ভিত্তি করেই এস ইউ সি আই (সি) কেরালায় ১২টি জেলার ৩৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

কেরালার বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী তালিকা

জেলা	কেন্দ্র	প্রার্থী
ত্রিবান্দ্রম	১। ত্রিবান্দ্রম	পি এস গোপাকুমার
	২। কট্টাক্কাডা	এস শ্রীকুমার
কোল্লাম	৩। এরাভিপুরম	বি বিনোদ
	৪। কুন্ডারা	ভি অ্যান্টনি
	৫। পুনালুর	কে শশাঙ্কন
পাথানামথিট্টা	৬। আরামুলা	অনিলকুমার কে জি
আলাপ্পুঝা	৭। আরুর	প্রতাপন কে
	৮। আলাপ্পুঝা	কে এ বিনোদ
	৯। আমবালাপুঝা	আর অর্জুনন
	১০। হরিপ্পাদ	এ মহম্মদ
	১১। কুট্টানাড	নন্দানন ভি (সমর্থিত নির্দল)
	১২। মাভেলিক্কারা (এস সি)	আশা টি
	১৩। চেঙ্গান্নুর	কে বিমলজি
কোট্টায়াম	১৪। বাইকমম (এস সি)	অনিলা বোস
	১৫। ইত্তুমানুর	আশা রাজ
	১৬। কোট্টায়াম	রাজিতা জয়ারাম
	১৭। পুথুপ্পাল্লি	এম ভি চেরিয়ান
	১৮। চেঙ্গানাসেরি	কে এন রাজন
	১৯। পুনজার	রাজু ভাট্টাপ্পারা
ইডুকি	২০। থোড়ুপুঝা	নিশা জিমি
এরনাকুলাম	২১। পিরাভম	সুধীর কে ও
	২২। ত্রিপুনিথুরা	এম পি সুধা
	২৩। আলুভা	এ ব্রহ্মা কুমার
	২৪। অঙ্গামালি	এম কে কানজনাভাল্লি
ত্রিশুর	২৫। কোডুঙ্গালুর	সি এস কৃষ্ণকুমার
	২৬। গুরুভায়ুর	সি ভি প্রেমরাজ
	২৭। ত্রিশুর	এম প্রদীপন
পালাক্কাড	২৮। চিত্তুর	এ রাজিনা
কোঝিকোড	২৯। কোঝিকোড (উত্তর)	জেনিফার
	৩০। কুইলানাডি	পি এম শ্রীকুমার
	৩১। কুট্টিয়াডি	বালান
ওয়াইনাড	৩২। সুলতানবাথেরি (এস টি)	শ্রীধরন সি আর
কান্নুর	৩৩। আঝিকোড	বিবেক পি সি

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার লক্ষণপুর এলাকার পার্টিকর্মী কমরেড হারাধন মাণ্ডি ২১ মার্চ মারণব্যাধি মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর জানার সাথে সাথেই স্থানীয় পার্টি ইনচার্জ কমরেড জাপানী পরামানিক সহ এলাকার প্রবীণ নেতা কমরেড হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, কানাই মণ্ডল, শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড দীপেন বাউরী প্রমুখ পার্টি অফিসে এসে জড়ো হন। সেখানে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সেখান থেকে নেতৃবৃন্দ প্রয়াত কমরেড হারাধন মাণ্ডির বাড়ি মুজরাকুন্দিতে যান। গ্রাম ও দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে। কমরেড হারাধন মাণ্ডির মরদেহে জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব পালের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানানো হয়। দলের প্রবীণ কৃষক নেতা কমরেড বনমালী পরামানিক সহ অনেকেই মাল্যদান করেন।

গরিব আদিবাসী পরিবারের সন্তান কমরেড মাণ্ডি দলের সাথে যুক্ত হন ৭০-এর দশকে। আমৃত্যু তিনি দলের সাথেই ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়দের দলের সমর্থকে পরিণত করেছেন। তিনি দলের বক্তব্যকে সাঁওতালি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে আলোচনা করতেন এলাকার জনসাধারণের কাছে। তাঁর সহজ সরল সাবলীল জীবন ও জনদরদি চরিত্রের জন্য তাঁকে সকলেই ভালবাসতেন।

কমরেড হারাধন মাণ্ডি লাল সেলাম

যে কোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে

শিবদাস ঘোষ

আগামী ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হল।

এ কথা ঠিক যে, দেশে খাদ্য সংকট তীব্র হচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না, বেকার সমস্যা বাড়ছে, বিদ্যুৎ নেই — এই সমস্ত সমস্যায় আমরা ঘরে ঘরে ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় ক্ষতি, নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এবং যুক্তিহীন মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজজীবনে যে সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, সেখানে ঘটছে। মনে রাখা দরকার, অভাব এবং অত্যাচারের তাড়না যতই হোক না কেন তার দ্বারা একটা জাতিকে মেরে ফেলা যায় না। ব্রিটিশরা দুশো বছরের উপর আমাদের পদানত করে রেখেছিল। কিন্তু, গোটা জাতিটাকে মারতে পারেনি। ভিয়েতনামকে বোমা মেরে মেরে আমেরিকা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে এবং সেখানকার মানুষগুলোকে একেবারে মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গোটা দেশের, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙতে পারেনি। কিন্তু, আমাদের দেশের শাসক সম্প্রদায় আজ দেশে কি শুধু অর্থনৈতিক দুর্দশাই সৃষ্টি করছে? যে যুক্তি দ্বারা তারা নিজেদের অন্যায় আচরণকে সমর্থন করছে, লোককে সমর্থন করতে বলছে, পুলিশ যেভাবে প্রকাশ্যেই প্রতিদিন আইনকে পদদলিত করে চলেছে, এবং পুলিশের এইসব আচরণকে রাজনৈতিক নেতারা এবং প্রশাসকরা যেভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন; উপরন্তু, যুক্তিহীন মানসিকতা যদি এমন স্তরে পৌঁছে থাকে যে, দেশের তরুণরাও কোনও কিছু বুঝতে না চান, রাস্তাঘাটে অশালীন আচরণ করেন এবং তা দেখে বয়স্করাও চুপ করে থাকেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অপরের মতামত সম্বন্ধে সহনশীলতার এরূপ অভাব ঘটে থাকে, তাহলে কী প্রমাণ হয়? শুধু আমরা খেতে পাচ্ছি না এবং আমাদের অভাব — এইটেই প্রমাণ হয়? নাকি, এটাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে? মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে।

যখন পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও আমি এ বিষয়ে বারবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখন আমাদের কথা কেউ শুনতে চায়নি। বরং আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে, আমরা নাকি ডিসরাপ্টার (বিভেদকামী), আমরা ঐক্য নষ্ট করছি। ঐক্যের স্বার্থে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে যখনই কোনও দলের কোনও ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা বলতে গিয়েছি তখনই ঐক্যবিরোধী বলে ব্যুয়িং করে, শোরগোল করে আমাদের বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অথচ, সেই ঐক্য গড়ে উঠে কী হল? ঐক্য তো গড়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হয়েছিল। তাদের সমর্থনও যুক্তফ্রন্টের পিছনে ছিল। তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল কী করে? আমার মনে পড়ে, আমি তখনও এই বিপুল জনসমর্থনের নৈতিকতার মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলাম যে, এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন দেখে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তারা দুনিয়ার ইতিহাসের গতি লক্ষ করেনি। তাদের বোঝা দরকার যে, এই সমর্থনটাই আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই বিপুল জনসমর্থনের রাজনৈতিক চেতনার মান, সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক মান কতটুকু? যে মানুষগুলোর সমর্থন আমরা পাচ্ছি সেই মানুষগুলোর নিম্নগামী সংস্কৃতিগত মানের দিকে আমরা এতটুকু লক্ষ রেখেছি? বরং তারা আমাদের সমর্থন করছে বলে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের অসুবিধে হবে বলে তাদের যেকোনও কাজকেই আমরা সমর্থন করেছি।

... যে কোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে নিহিত থাকে। সংস্কৃতিগত এবং রুচিগত মান যদি উঁচু না থাকে, তাহলে যেকোনও একটি উঁচুদরের রাজনৈতিক আদর্শের ধাঁচাটা একটা প্রাণহীন দেহের মতো হয়ে যায়। একটা শরীর দেখতে খুব সুন্দর হলেও যদি তার প্রাণ না থাকে তাহলে তা যেমন অকার্যকরী, ফেলে রেখে দিলে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, তেমনি কেউ কোনও একটা বড় আদর্শের কথা বলেও যদি উন্নত রুচি এবং সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত না করে তাহলে সেটাও ঠিক সেইরকম সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং পচনশীল। কাজেই কোনও একটা পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কিনা তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে কিনা। ফলে, সিপিআই(এম) যদি সত্যিকারের বিপ্লবী দল হয় তাহলে তার প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সমাজের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের অবক্ষয় থেকে যে নিম্নগামী মান এবং নৈতিকতার অধঃপতন শুরু হয়েছে তার উপর একটা রেস্ট্রেনিং এফেক্ট (কার্যকরী বাধা সৃষ্টি) হবে। কিন্তু তা দেখা গেল না। বরং, উল্টোটাই ঘটতে দেখা গেল। রেস্ট্রেনিং এফেক্ট তো হলই না, উপরন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন সিপিআই(এম)-এর প্রভাব যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল, দেখা গেল সেই সময়েই প্রথম ছাত্রদের মধ্যে গণ-টোকাটুকি শুরু হয়েছে। তাদের দলে যে যুবসম্প্রদায় আসছে, তারা যখন স্লোগান দিচ্ছে তাদের কোমর দুলছে। যারাই তাদের কোনওরূপ সমালোচনা করতে গেছে, তাদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ কর্মীর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে রুচিগত ও সংস্কৃতিগত মান প্রকাশ পেয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তারা যুক্তিতর্কের মধ্যেই আসতে চায়নি, মানুষ বলেই কাউকে গ্রাহ্য করেনি। কেউ বিরোধিতা করলেই তাকে হয় মেরেছে, আর না হয় নানাভাবে হিউমিলিয়েট (অপমানিত) করেছে। তাহলে, এই আচরণের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের, উগ্র ফ্যানাটিক (অন্ধ সমর্থক) দের, যারা যুক্তিহীন অন্ধ মানসিকতা সমাজে গড়ে তুলতে চায় তাদের সঙ্গে এইসব তথাকথিত বিপ্লবীদের আচরণে পার্থক্য কোথায়? তাই আমি তখন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলাম, জনসাধারণকে খেপালেই বিপ্লব হয় না। বিপ্লব সেই জনসাধারণই করতে পারে, যারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে খানিকটা অর্থে বিপ্লবের উপযোগী মানসিকতা এবং সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে। যে কোনও উপায়ে মানুষকে উত্তেজিত করলেই তার দ্বারা বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের নামে প্রতিক্রিয়ার জমি তৈরি হয়। ভারতের মাটিতে বারবার ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছে। ফলে, এই মারাত্মক ভুল রাজনীতি ও কার্যকলাপের জন্য সমাজমানসে যে যুক্তিহীন মানসিকতা বিরাজ করছে তারই সুযোগে আজ কংগ্রেসি প্রতিক্রিয়ার প্রবল অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অতীতের ভুল-ত্রুটি যাই হয়ে থাকুক না কেন তাকে সংশোধন করে আবার আপনাদের সংগঠিত হতে হবে। অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিদিনের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবার আপনাদের ধীরে ধীরে সংহত হতে হবে। এ যেমন সত্য কথা, তেমনি এর সাথে সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। তা হচ্ছে, এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে যদি আপনারা সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চান, অর্থাৎ জনগণের মুক্তির অর্থে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে চান, তাহলে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত জরুরি প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলে চলবে না।

... আমি আপনাদের কাছে বলছি, মানুষ আবার ভাবছে। না খেতে পাওয়া মানুষগুলো আবার ধীরে ধীরে মাঠে-ময়দানে জড়ো হতে শুরু করছে। উপর থেকে যত ঢাকঢোল পেটানোই হোক ভিতরে ভিতরে মানুষ কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহমুক্ত হচ্ছে। ফলে, অতীতে যেমন সম্মিলিত সংগ্রাম হয়েছে, বহু রক্তপাত হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতেই, দু'চার বছরের মধ্যেই আবার সম্মিলিত জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠবে। কিন্তু আমি যে জায়গাটা নির্দিষ্ট করে বারবার বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, দুর্বার আন্দোলন আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই হবে। কিন্তু, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি ভুল পার্টি, অমার্কসবাদী পার্টি, অবিপ্লবী পার্টির হাতেই থেকে যায়, অর্থাৎ এমন দলগুলোর হাতে থেকে যায়, যারা বিপ্লবের নাম ভাঙিয়ে চলে, বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করে, অর্থাৎ অসময়ে উগ্র আচরণ করে বিপ্লবের শক্তিকে নিঃশেষিত করে দেয়; আর না হয় বিপ্লব-বিপ্লব স্লোগানের আড়ালে শেষপর্যন্ত সংসদীয় রাজনীতির গণ্ডির মধ্যেই গণআন্দোলনগুলিকে আটকে রাখতে চায়, তাহলে সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাছাড়া, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে একদিকে ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলির মিলনের জন্য ঐক্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এমনভাবে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা, যাতে আন্দোলনের ঐক্যও বিনষ্ট না হয়, অথচ আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়, জনগণকে সঠিক বিপ্লবী দল চিনে নিতে সাহায্য করা হয় — তেমন কায়দায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে পরিচালনা করার ক্ষমতা একমাত্র বিপ্লবী দলেরই থাকতে পারে। অবিপ্লবী দলের এ ক্ষমতা নেই। যুক্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে অবিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে দুটো ঝোঁক দেখা দেবেই। হয় ঐক্য রক্ষা করার অত্যুৎসাহে তারা সকলকে অ্যাপিজ (তোষামোদ) করবে, আর না হয় উগ্র আচরণ করবে। অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে কেউ সমালোচনা করলেই তারা তাদের আঘাত করে ঐক্যকে ভাঙবে। গত যুক্তফ্রন্ট আমলেও ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছে। তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আজ যখন আবার পা বাড়াতে চলেছেন তখন সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথেই অতি দ্রুত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব যাতে সত্যিকারের বিপ্লবী দল দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন দলের রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে দল বিচার করে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে সেই দলকেও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

... দল যদি অবিপ্লবী দল হয়, তার রাস্তা যদি ভুল হয়, তার বিপ্লবের তত্ত্ব যদি ভুল হয়, তাহলে বিপ্লব-বিপ্লব খেলায় সমস্ত জনগণের কোরবানি, কর্মীদের আত্মত্যাগ হেলায় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে প্রতিক্রিয়া আবার শক্তিশালী হয়। কাজেই একটা ভুল রাজনৈতিক দল — নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি, রুচি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ — সমস্ত দিক থেকে ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাবে, যার মধ্যে ক্ষয় ধরে গিয়েছে, ক্ষয়িষ্ণু, আজও বড় দল বলে যদি তেমন দলেরই আপনারা পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলে সেই বড় দল আন্দোলনকে বিপথগামী করবেই, এবং সর্বনাশ আরও বেশি হবে। একটা দল বড় কি ছোট, এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিকই। কিন্তু, তার চেয়েও একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে, তা হচ্ছে দলের রাজনীতিটা ঠিক কি না, দলের চরিত্রটা ঠিক কি না, এবং দলটা সত্যিকারের বিপ্লবী দল কি না।

'ফ্যাসিবাদ ও বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট'
শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড

পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, সাম্প্রদায়িক বিজেপি, দক্ষিণপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং সিপিএমের সুবিধাবাদী রাজনীতিকে পরাস্ত করুন

বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া ও মহিষাদল কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে কমরেড নারায়ণ প্রামাণিক ও কমরেড তপন মাইতির প্রচার মিছিল

তমলুকে সভা

১২ এপ্রিল তমলুক এস ডি ও অফিসে তমলুক, পূর্ব ও পশ্চিম পাঁশকুড়া, নন্দকুমার, ময়না, চণ্ডীপুর বিধানসভার এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেডস সতীশ সাউ, নারায়ণ নায়ক, সেক আবদুল মাসুদ, সৌমিত্র পট্টনায়ক, মদন সামন্ত, স্বপন ভৌমিক মিছিল করে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরপর বিকেল ৪টায় তমলুক হাসপাতাল মোড়ে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। এছাড়া জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি ও কমরেড অনুরূপা দাস বক্তব্য রাখেন।

ভগৎ সিং স্মরণে এস এস কে এমের ডাক্তার ও ছাত্ররা

শহিদ ই আজম ভগৎ সিং-এর জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে ১২ এপ্রিল এক আলোচনার আয়োজন করেছিলেন এস এস কে এম মেডিকেল কলেজের ছাত্র, জুনিয়ার ডাক্তার ও স্টাফ নার্সরা কলেজের ১নং লেকচার থিয়েটারে। প্রধান বক্তা ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত ও রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ মৃদুল সরকার। উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা সংগঠন 'আই পি জি এম ই আর সোসিও কালচারাল ফোরাম'এর পূর্বতন সহসভাপতি ডাঃ কবিউল হক। সভা পরিচালনা করেন এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র অনিকেত মাহাত।

সকল ছাত্রের উত্তরপত্র দেখানো, সমস্ত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, গণিত অনার্সের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেওয়া, সি বি সি এস এবং সেমেস্টার সিস্টেম বাতিলের দাবিতে ৩ এপ্রিল ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের বিনোবা ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভ।

আই আই টি-র ফি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানো হল

গরিব ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য

দোকানে পণ্য কিনতে গেলে ক্রেতাদের উদ্দেশে নানা লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তাতে বহুসময়েই থাকে— দুটি বা তিনটি কিনলে একটি 'ফ্রি'। দুটো কিনলে একটা ফ্রি-র রহস্য আজ জানা হয়ে গেছে মানুষের। গ্রাহকদের স্রেফ প্রতারণা করা ছাড়া এটা আর কিছু নয়। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির এই কৌশলে প্রতারিত হবেন জেনেও ক্রেতা লোভ সামলাতে পারেন না। আসলে যা ফ্রি হিসাবে দেওয়া হয়, তার দাম অন্যগুলির সাথে ধরে নিয়ে তার উপর লাভ রেখেই এই ফ্রি-তে দেওয়ার কৌশল নেয় বিক্রেতারা।

যে বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা, তা কোনও পণ্য নয়। যদিও শিক্ষাকে পণ্য হিসেবেই দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ব্যবসায়ীকুল। তাদের কাছে উচ্চশিক্ষা মুনাফা করার আরও বড় ক্ষেত্র। সম্প্রতি দেশের উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আই আই টি)-গুলিতে ফি ৯০ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সবুজ সংকেত পেয়েই কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণা। তাতে সংরক্ষিত কোটার (এস সি-এস টি এবং প্রতিবন্ধী) ভিত্তিতে ফি মকুবের ঘোষণা করে দাতা সাজার চেষ্টাও করেছে আই আই টি কর্তৃপক্ষ। বলা হয়েছে, যে ছাত্রের অভিভাবকদের বাৎসরিক আয় ১ থেকে ৫ লাখ টাকার মধ্যে, তাদের ফি-তে সেই অনুযায়ী ছাড় দেওয়া হবে। ফি-তে ছাড় দেওয়ার তত্ত্ব এমনভাবে হাজির করা হচ্ছে যেন সরকার বা কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে এমনটা করছে। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গর্ব করা ভারতে এমনিতেই শিক্ষার অধিকার প্রতিটি ছাত্রের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সেই অধিকারকে হরণ করল কর্তৃপক্ষ তথা সরকার। অর্থের অভাবে এমনিতেই বহু ছাত্র এই ধরনের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। এই বিপুল ফি বৃদ্ধিতে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী দূরে সরে যেতে বাধ্য হবেন।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ফি দিতে না পেরে পড়া ছেড়ে দিতে হবে, এমন ছাত্র আই আই টি-তে নেই। আবার কেউ বলছে, এস সি-এস টি এবং প্রতিবন্ধী ছাত্রদের তো ফি থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাকি ছাত্ররা কী দোষ করল? তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী নন এবং কোনও কোটার অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটা কি তাদের দোষ? সেজন্য তাদের বিপুল ফি দিয়ে পড়তে হবে? আসলে আই আই টি কর্তারা বুঝতেও পারেন না যে, তারা যে ফি-কাঠামো ইতিমধ্যেই বেঁধে দিয়েছেন,তাতে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীরা এমন প্রতিষ্ঠানে আসতেই পারে না। কর্তৃপক্ষের 'মহানুভবতার' প্রকাশ ঘটছে অন্যত্র। গরিব-মধ্যবিত্ত ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানে পড়তে গিয়ে যে মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ করতে বাধ্য হবে, সেই ঋণের ব্যবস্থা তারা করে দেবে। আই আই টি কর্তৃপক্ষ কি একই সাথে মহাজনী ব্যবসাও চালাচ্ছেন? বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ছাত্ররা পড়ার থেকে ধার শোধ করার জন্যই বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে না কি? এতে পড়াশোনার মান বাড়বে তো?

ফি বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি করতে গিয়ে সরকারের আধিকারিকরা বলেছেন, আই আই টি, আই আই এম-এ পড়া ছাত্ররা অনেকেই ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিলের মতো স্টার্ট-আপ বিজনেস-এ ঢুকবে। প্রশ্ন হল ছাত্ররা আগে পড়ার সুযোগ পাবে, তবে তো বিজনেসে যাবে। নাকি আই আই টি না পড়েই তারা লাফ দিয়ে বিজনেসে ঢুকে যাবে? আর সকলেই স্টার্ট-আপ বিজনেসে যাবে এ কথা নিশ্চিত করে বলছেন কী করে তাঁরা? উচ্চশিক্ষায় বেসরকারিকরণ এবং ফি বৃদ্ধি করতে গিয়ে বারেবারেই সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের ছেঁদো যুক্তি তোলা হয়েছে। মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফি বৃদ্ধির প্রশ্নে যুক্তি তোলা হয়েছিল, ছাত্ররা পাশ করে বহু টাকা আয় করবে, পড়ার সময় টাকা চাইলেই দোষ?

দ্বিগুণেরও বেশি ফি বৃদ্ধির অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে যেমন দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে তেমনই আই আই টি-র ছাত্ররাও তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে তারা প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে। খড়্গপুর আই আই টি-র পাঁচশো ছাত্রছাত্রী প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। আই আই টি-র এক ছাত্র পীযূষ গৌতম বলেন, দু'বছর আগে ফি ছিল ৫০ হাজার টাকা, তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৯০ হাজার টাকা, এবার একলাফে তা বেড়ে হয়েছে ২ লাখ। আগে এর সাথে অন্যান্য ফি ধরলে বছরে দেড় লাখ খরচ হত, এখন তা তিন লাখ হবে। যা আমাদের মতো বেশিরভাগ পরিবারেরই সাধ্যের বাইরে। খড়্গপুর আই আই টি-তে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত বলে জানিয়েছেন প্রতিবাদীরা।

আসলে আই আই টিতে ফি বৃদ্ধি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক বেসরকারিকরণেরই একটা ধাপ এটা। উচ্চশিক্ষায় বেসরকারিকরণের দরজা আরও সম্প্রসারিত করে দেওয়া হল সাধারণ ছাত্রদের কথা না ভেবেই। কারণ, তারা জানে, দেশের মুষ্টিমেয় হলেও মানুষ আছে যারা বিপুল অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাকে কিনতে পারবে। তাই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছে বিপুল অর্থের ক্রেতা 'ধনীর দুলালদের' জায়গা। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রথম শিক্ষার বেসরকারিকরণের দরজা খুলে দেয়। বিজেপি এসে তাকে আরও ব্যাপক রূপ দিল। আম্বানি, টাটা, বিড়লার শিক্ষা ব্যবসা যা দেশের প্রান্তে প্রান্তে মহীরুহে পরিণত হয়েছে, তাকে আরও ফুলে-ফলে পল্লবিত করার সুযোগ করে দিল পুঁজিমালিকদের বন্ধু কংগ্রেস এবং বিজেপি। তাদের সেবা করতে গিয়ে দেশের বড় অংশের সাধারণ ঘরের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল, শিক্ষার সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হল। শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী ছাত্রদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং গরিবদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত কার্যকর করা হল। আই আই টি-তে ফি বৃদ্ধি সেই উদ্দেশ্যেই।

ছাত্রদের একক প্রতিবাদে কি সরকারের এই ঘৃণ্য অভিসন্ধিকে রোখা যাবে? ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী মানুষকে সম্মিলিতভাবে আন্দোলনে সামিল হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে— শিক্ষার বেসরকারিকরণ আমরা মানছি না, মানব না। লাগাতার আন্দোলনই পারে সংগঠিত মালিক ও সরকারের থেকে জনগণের দাবি ছিনিয়ে আনতে।

জাপানে যুদ্ধবিরোধী মানুষের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

২২ মার্চ পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন জাপানের প্রায় ৪০ হাজার শান্তিকামী মানুষ। টোকিও শহর মুখরিত হল যুদ্ধবিরোধী সোচ্চার স্লোগানে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের মন্ত্রীসভা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দুটি আইন পাশ করেছে। এই আইন দুটির বিরুদ্ধেই ছিল এদিনের বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, নতুন এই আইন জাপানের সংবিধানের যুদ্ধবিরোধী ধারার বিরোধী।

কী আছে এই আইনে? ১৯৪৫ সালের আইন অনুযায়ী যতখানি সামরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল, নতুন আইনে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ তার চেয়ে আরও বেশি আগ্রাসী রূপে নিজের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। নিজে আক্রান্ত না হলেও সহযোগী দেশ আক্রান্ত — এই অজুহাত তুলে জাপান এর পর থেকে নিজের সামরিক বাহিনী দেশের বাইরে পাঠাতে পারবে। এই আইনের পিছনে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন করে বাজারের ভাগ-বাঁটোয়ারার লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর তার প্রভাবাধীন বাজার দখল করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপানের নখ-দাঁত ভেঙে দিতে চেয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাপানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের যে বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তাকে ভিত্তি করে এবং দেশের অভ্যন্তরেও যুদ্ধে বিপর্যস্ত জনসাধারণের যুদ্ধবিরোধী মানসিকতার চাপ — সব মিলিয়ে জাপান সরকার সামরিক আগ্রাসনে না যাওয়ার আইন করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপান সরকার পূর্ব এশিয়ায় নিজের সামরিক প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। এই আইন সেই চাহিদারই পরিপূরক।

চিন ও উত্তর কোরিয়ার মোকাবিলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক শক্তিকে কাজে লাগাতে চাইছে। ঠিক যেমন করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমদারি মেনে ইউরোপে ব্রিটিশ, ফরাসি ও জার্মান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধজোট 'ন্যাটো' কাজ করে, সেভাবেই জাপানকে কাজে লাগাতে চাইছে আমেরিকা।

জাপানের শাসক শ্রেণি নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণ করতে যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে, তা কিন্তু মানতে পারছেন না সে দেশের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ। গত বছর গ্রীষ্মকালে প্রথম যখন এই আইন তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করল জাপান সরকার, তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রবল বিক্ষোভ। লক্ষাধিক মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন। জাপানের মূল ভূখণ্ড থেকে ৪০০ মাইল দূরবর্তী ওকিনাওয়া দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে জাপানে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৩০ হাজার মানুষ টোকিওর পার্লামেন্ট ভবন ঘিরে রেখে সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েই প্রথম নিজেকে পূর্ণ মানুষ বলে অনুভব করেছি

পল রবসন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান বিপদ হিসাবে দেখতে থাকে কমিউনিস্ট সোভিয়েট ইউনিয়নকে। শুরু হয় কমিউনিস্ট সন্দেহে দেশের মানুষের উপর ব্যাপক নজরদারি, গোয়েন্দাগিরি, তল্লাশি। তদন্ত চালাবার জন্য তৈরি হয় বেশ কয়েকটি কমিটি। এগুলিরই একটি ছিল 'হাউস অফ আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস কমিটি'। কমিউনিস্ট সমর্থক মনে হলেই সন্দেহভাজনদের খাড়া করিয়ে দেওয়া হত এইসব কমিটির কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সামনে। সেনেটর ম্যাকার্থি ছিলেন অন্যতম তদন্তকারী। তাঁর নাম অনুসারে সেই সময়টাকে বলা হয় ম্যাকার্থি-জমানা। ১৯৫৬ সালে সেই ম্যাকার্থি জমানায় বর্ণবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ বিশ্বখ্যাত গায়ক পল রবসনকে হাউস অফ আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস কমিটির সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সেই জবানবন্দির নির্বাচিত কিছু অংশ প্রকাশ করা হল।

রবসন ঃ একটা সম্মেলনে আমি বক্তব্য রাখছিলাম। মনে রাখবেন, সেটা ছিল একটা শান্তি সম্মেলন। বিশ্বের উপনিবেশগুলি থেকে প্রায় দু'হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেই সময় নিজের নিজের দেশের সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দোনেশিয়া, ভারত, আফ্রিকার মতো দেশগুলোর সেই ছাত্রছাত্রীরা আমাকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের একজন নেতা মিঃ ওয়াই এম দাদুকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যে শান্তির জন্য সংগ্রাম করছেন, সে কথা উল্লেখ করতে। বলেছিলেন, তাঁরা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ চান না। যেসব দেশ থেকে এই ছাত্ররা এসেছিলেন, সেখানকার জনসংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ কোটি। ...

রবসন ঃ ... এটা আজ পরিষ্কার, অন্য দেশের ৯০ কোটি অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষ বলছে যে, তারা যুদ্ধ করবে না। ভারতের ৪০ কোটি এবং অন্যান্য দেশের আরও কোটি কোটি মানুষ সর্বত্র আপনাদের বলছে, অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষ প্রাণ দিতে রাজি আছে কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়। আমরা কেবল দেড় কোটি কৃষ্ণাঙ্গর কথা বলছি না, বলছি কোটি কোটি অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের কথা।

কেয়ার্নে ঃ সাক্ষী প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

রবসন ঃ আমি প্রথমবার নিজেকে একজন মানুষ বলে অনুভব করতে পেরেছি রাশিয়ায় গিয়ে। আমেরিকার মিসিসিপিতে কিংবা ওয়াশিংটনে যেমন আছে, গায়ের রঙ নিয়ে তেমন কোনও কুসংস্কার রাশিয়ায় নেই। ওখানে গিয়েই প্রথমবার আমার নিজেকে পূর্ণ মানুষ বলে মনে হয়েছে। গায়ের রঙের জন্য ওখানে আমাকে কোনও রকম মানসিক চাপ ভোগ করতে হয়নি, যা আজকের এই কমিটিতে উপস্থিত হয়ে আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে।

স্কেরার ঃ আপনি রাশিয়ায় গিয়ে বাস করেন না কেন?

রবসন ঃ করি না, কারণ আমার বাবা ছিলেন এ দেশেরই একজন দাসশ্রমিক। করিনা, কারণ আমার নিজের লোকজন এই দেশটাকেই গড়ে তুলতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আপনাদের মতো এ দেশটা আমারও। এটা পরিষ্কার জেনে রাখুন, কোনও ফ্যাসিস্ট মানসিকতার লোকের সাধ্য নেই আমায় এ দেশ থেকে তাড়ায়। আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তির পক্ষে, চিনের সঙ্গে শান্তির পক্ষে দাঁড়াব। কিন্তু ফ্যাসিস্ট ফ্র্যাঙ্কোর সঙ্গে শান্তি কিংবা বন্ধুত্বের পক্ষে আমি নেই। ফ্যাসিবাদী নাৎসি জার্মানির পক্ষেও আমি নেই। আমি ভাল মানুষদের সঙ্গে শান্তির পক্ষে।

স্কেরার ঃ আপনি কমিউনিস্টদের আদর্শ প্রচারের জন্য এখানে এসেছেন।

রবসন ঃ আমি এখানে এসেছি কারণ আমি নয়া-ফ্যাসিস্ট মতবাদের বিরোধিতা করি। আমি দেখছি, এই সব কমিটিতে ওই মতবাদের প্রসার ঘটছে। ...

... চেয়ারম্যান ঃ আপনি কোন কুসংস্কারের কথা বলছেন? আপনি রাটজার্স এবং পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ... আপনার গায়ের রঙ নিয়ে এখানে কোনও বিরূপ ধারণা নেই। আপনার ছেলেকে রাটজার্সে পড়তে পাঠালেন না কেন?

রবসন ঃ দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি অকপটভাবে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আপনার বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি, হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন নিগ্রো সাফল্য পেয়েছে। এদের মধ্যে আমি কিংবা জ্যাকি রবিনসন পড়ি। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গবেষণার রিপোর্টই বলছে, এ দেশের দক্ষিণাংশে হাজার হাজার নিগ্রো পরিবার আছে যাদের সারা বছরের রোজগার মাত্র সাতশো ডলার। আমার বাবা ছিলেন একজন দাসশ্রমিক, আমার সম্পর্কিত ভাইয়েরা ভাগচাষি। আমার সাফল্যকে আমি একান্ত নিজের সাফল্য বলে ভাবিনি। সেই কারণেই, এই সাফল্যকে যে চোখে দেখার কথা, তা আমি দেখিনি। আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে আমি আক্ষরিক অর্থেই হাজার হাজার ডলার ত্যাগ করেছি, পরিমাণটা লক্ষ লক্ষও হতে পারে।

আরেন্স ঃ মস্কোয় থাকার সময়ে আপনি স্ট্যালিনের প্রশস্তি করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন?

রবসন ঃ আমার জানা নেই।

...

আরেন্স ঃ স্ট্যালিন সম্পর্কে আপনার মতামত কি সম্প্রতি পাল্টে গেছে?

রবসন ঃ ভদ্রমহোদয়গণ, স্ট্যালিন সম্পর্কিত যা কিছু বিষয়, তা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিচার্য। আপনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি তর্কবিতর্ক করব না। কারণ, আমেরিকাকে গড়ে তুলতে আফ্রিকার ৬ থেকে ১০ কোটি কালো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে যারা, আপনারা তাদের প্রতিনিধি। দাসশ্রমিক বোঝাই জাহাজে এবং চাষের খেতে ৬ থেকে ১০ কোটি কালো মানুষকে হত্যা করার জন্য আপনারা দায়ী, আপনাদের পূর্বপুরুষ দায়ী। দয়া করে অন্য কারওর সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

...

রবসন ঃ আমি আগেই বলেছি, যারা আমার মতো ৬ কোটি কৃষ্ণাঙ্গকে খুন করেছে, তাদের সাথে আমি কোনও কিছু আলোচনা করব না, স্ট্যালিনকে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলব না।

আরেন্স ঃ আপনি নিশ্চয় সোভিয়েট রাশিয়ার দাস শ্রমিকদের ক্যাম্পগুলি নিয়েও আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইবেন না।

রবসন ঃ কোনওদিন যখন আমি রুশদের মাঝে থাকব, তাদের জন্য গাইব, সেখানে স্ট্যালিনকে নিয়ে আমি আলোচনা করব। এটা তাদের বিষয়।

রবসন ঃ (বেন ডেভিস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে) আমি বলছি যে, তিনি ততটাই দেশপ্রেমিক যতটা একজন মার্কিন নাগরিক হতে পারে এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যারা 'অ্যালিয়েন অ্যান্ড সিডিশন' আইন নিয়ে বসে আছেন, তাঁরা দেশপ্রেমিক নন। আপনারা আমেরিকাবিরোধী এবং নিজেদের নিয়ে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

চেয়ারম্যান ঃ একটু দাঁড়ান। শুনানি এখনকার মতো স্থগিত রাখা হচ্ছে।

রবসন ঃ আমি মনে করি, সেটাই হওয়া উচিত।

চেয়ারম্যান ঃ আমি এতক্ষণ সমস্তটা সহ্য করেছি।

রবসন ঃ আমার বিবৃতিটা কি পড়তে পারি?

চেয়ারম্যান ঃ না। বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে।

রবসন ঃ আমার মনে হয়, সেটাই করা উচিত এবং এই বৈঠক চিরতরে স্থগিত করে দেওয়াই দরকার। এটাই আমি বলতে চাই ....।

গুড়গাঁও-এর নাম পরিবর্তন অনৈতিহাসিক

হরিয়ানার গুড়গাঁও শহর ও জেলার নাম পরিবর্তন করে ‘গুরুগ্রাম’ এবং মেওয়াত জেলার নাম ‘নুহ’ রাখার রাজ্য সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে তা বাতিলের দাবি জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যবান বলেন, গুড়গাঁও-এর পরিবর্তে গুরুগ্রাম নাম রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। নাম পাল্টালেই জনজীবনের কোনও উন্নতি হয় না। দেশ-বিদেশে মানুষ গুড়গাঁওকে গুড়গাঁও নামেই চেনে। এই তুঘলকি ফরমানের ফলে সমস্ত সাইনবোর্ড, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি বদল করতে অনর্থক হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। সুদূর অতীত থেকেই গুড়গাঁওয়ের নাম এটাই ছিল, কখনওই গুরুগ্রাম ছিল না। হরিয়ানি ভাষার মৌলিকতা রয়েছে গাঁও শব্দের মধ্যেই। এটা সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে ইতিহাসকে মুছে ফেলার এক অপচেষ্টা। ইতিপূর্বেও এই সরকার চণ্ডীগড় বিমানবন্দরের নাম থেকে মহান বিপ্লবী শহিদ ভগৎ সিংহের নাম মুছে দিতে চেয়েছিল।

কমরেড সত্যবান বলেন, পুরাণ প্রাচীন গ্রন্থ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ইতিহাস নয়। পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাস বলে চালানোর চেষ্টা, হরিয়ানার মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার এক প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ। যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক মননকে মেরে দিয়ে মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস গড়ে তোলার এ এক ষড়যন্ত্র। রাজপরিবারের গুরু দ্রোণাচার্যের নামে কোনও স্থানের নামকরণ করার দ্বারা রাজা-প্রজায় বিভক্ত সামন্তী সমাজব্যবস্থাকে মহিমামণ্ডিত করা যায়, কিন্তু নতুন সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্রে ওই ধরনের পুরনো বিচারধারার কোনও স্থান নেই। বিজেপি শাসনে শিক্ষাকে মুনাফা লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করে এবং শিক্ষক সমাজের উপর শোষণ-জুলুম চালিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর ‘গুরু’র নামে নামকরণ করা স্রেফ লোকঠকানো ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া এই বিষয়ে রাজ্যের মানুষের কোনও মতামত না নিয়ে মর্জি মাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই পদ্ধতিও গণতন্ত্রবিরোধী। অতীতে কংগ্রেস বা অন্য পার্টির সরকারও এই ধরনের আচরণ করত। গুড়গাঁও এবং মেওয়াত ছাড়াও সারা রাজ্যের মানুষকে এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসার জন্য কমরেড সত্যবান আহ্বান জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

একের পাতার পর

আর দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কোনও উপায়ই থাকবে না, কেউ আর কারচুপি করতে পারবে না। কীভাবে এমন অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করবেন? তিনি বললেন, সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করলে আর কেউ কোনও দুর্নীতি-কারচুপি করতে পারবে না। আজ আর কারও বুঝতে অসুবিধা নেই সেই পরিচয়পত্র নির্বাচনে কারচুপি কতখানি দূর করতে পেরেছে। তা আজ শুধু নাগরিক পরিচয়পত্র হিসাবেই কাজে লাগে। এই পরিচয়পত্র ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিয়েও ভোট দেওয়া যায়। এর পরেও বাঘা বাঘা সব নির্বাচন কমিশনাররা এসেছেন, যেমন এ রাজ্যে, তেমনি কেন্দ্রীয় স্তরেও। পরিস্থিতির পরিবর্তন কিছুই ঘটেনি।

এর একটি কারণ, নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের কাজের জন্যই রাজ্য প্রশাসনের উপর নির্ভর করতে হয়, তা সে ভোটার তালিকা তৈরিই হোক, আর নির্বাচন পরিচালনাই হোক। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি দলের প্রভাবমুক্ত হয়ে তাঁরা কাজ করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরা সভায় সভায় হুমকি দিচ্ছেন, ভোট শেষ হলেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আর থাকবে না, তখন আমাদের অধীনেই কাজ করতে হবে। ভোটারদেরও একই কথা বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ক’দিন থাকবে, তার পর তো আমরাই থাকব, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এই কথাগুলিই এক সময় সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের মুখ থেকে শোনা যেত।

অনেকেই ভাবেন, বুথ দখল বা ছাপ্পা ভোট দেওয়াটাই ভোট জালিয়াতি। বাস্তবে এর ব্যাপকতা আরও অনেক বেশি। যাকে এক সময় সিপিএম ‘শিল্পের’ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, রাজ্যের মানুষ যার নাম দিয়েছিল ‘বৈজ্ঞানিক রিগিং’। সেই বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের বিজ্ঞানীরা তখন সিপিএমের হয়ে কাজ করত, আর এখন তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। সিপিএম নেতারা এই বিজ্ঞানের যে স্কুল খুলেছিলেন, তা তো এখনও চালু। তা থেকে প্রতি ভোটে নতুন নতুন বিজ্ঞানীরা ট্রেনিং নিয়ে বেরোচ্ছে।

তা ছাড়া, এই সাইকেলের লোভ দেখানো, দু’টাকা কেজি চালের লোভ দেখানো, এসব দেখিয়ে ভোট চাওয়া — এও তো কারচুপি, দুর্নীতি। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও কেন একজন পিতাকে সন্তানের একটা সাইকেলের জন্য শাসক দলের কাছে মাথা নোয়াতে হবে, কেন স্বাধীন রোজগারের মাধ্যমে একজন মানুষ খাওয়ার চালটুকুও কিনতে পারবে না — এই সব গুরুতর প্রশ্নগুলি এর দ্বারা চাপা দিয়ে দেওয়া হয় না কি? এর ফলে গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে কি?

সিপিএম সরকারের সময়ে বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অজস্র অভিযোগ বারে বারে করেছে। ঠিক যেমন তৃণমূলের কারচুপি, হুমকি, রিগিংয়ের বিরুদ্ধে এখন অভিযোগ করতে হচ্ছে। বাস্তবে নির্বাচন কমিশন ঠুঁটো হয়েই থাকছে। কেন্দ্র রাজ্যের গোপন বোঝাপড়ার বাইরে নির্বাচন কমিশন এক পা-ও চলতে পারে না, এ বারের মতো তা অতীতেও বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ মাত্র পাঁচ বছর আগের বিধানসভা নির্বাচনে কিন্তু মানুষ নির্বাচন কমিশনের তোয়াক্কা করেনি। মানুষের দৃঢ় মনোভাবের সামনে সিপিএমের কোনও ‘বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’ই কাজ দেয়নি। কারণ রাজ্য জুড়ে মানুষের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ভিত্তি করে। এই প্রতিরোধ ভাঙা শাসক সিপিএমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মানুষ যখন অসংগঠিত থাকে, বিচ্ছিন্ন থাকে, শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতিতে ঘুরপাক খেতে থাকে, একবার একে ভোট দেয়, পরের বার নিজেকে প্রতারিত মনে করে অন্য কাউকে ভোট দিতে চায়, তখন শাসক দলগুলি প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, দলীয় দুর্বৃত্তদের কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থাটির দখল নিতে পারে।

সর্বোপরি, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায়, যতই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক না কেন, ভোটের ফলাফল যে শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণির ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। গভর্নমেন্ট ‘বাই দি পিপল’, ‘অফ দি পিপল’, ‘ফর দি পিপল’ — বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এককালের এই বাণী যে বাস্তবে ‘বাই দি, অফ দি, ফর দি বুর্জোয়া’-তে পর্যবসিত হয়েছে — এ কথা ভোটের ফলাফলে বারে বারে স্পষ্ট হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণির ইচ্ছা ও ষড়যন্ত্রের কাছে অসংগঠিত জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভেসে যায়। ২০০৬ সালে রাজ্যে যখন প্রবল সিপিএম সরকারবিরোধী হাওয়া বইছে, যখন সাধারণ মানুষ নিশ্চিত, সিপিএম ব্যাপক ভাবে পরাজিত হবে, তখন শাসক শ্রেণি নির্লজ্জ ভাবে সিপিএমের প্রচারে নেমে যায়। পাঁচ পর্বের প্রতি পর্বে ভোটের শেষে তারা প্রচার করতে থাকে, কোন জেলায় সিপিএম কত বেশি আসনে জিতছে। প্রতি পর্বের শেষে এই একটানা প্রচারের প্রভাব বিচ্ছিন্ন অসংগঠিত জনমতের উপর পড়ে। সিপিএম ২৩৫টি আসনে জেতে। এ যদি জনমতের রায় হত, তবে এই ফলাফলে জনগণের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যেত। ফল বেরোনোর পর যা একেবারেই দেখা যায়নি।

গত লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ দেখেছে, বিজেপিকে জেতাতে বুর্জোয়ারা কীভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা নির্বাচনে ঢেলেছিল, কীভাবে সব ধরনের সংবাদমাধ্যমকে কুক্ষিগত করে জনগণকে প্রভাবিত করেছিল। কীভাবে একজন ক্রিমিনাল স্তরের নিন্দিত নেতাকে বিকাশ পুরুষ হিসাবে তুলে ধরেছিল। মাত্র পাঁচ বছরেই মানুষ বুঝে গেছে, কীভাবে পবিত্র গণতন্ত্রের নামে তাদের প্রতারণা করা হয়েছে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভোলানো হয়েছে।

বাস্তবে এই পচে যাওয়া বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির পছন্দসই একটি দলকে সরকারে বসানো, তেমনই তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী একটি দলকে বিরোধী পক্ষে বসানোর কাজেই নির্বাচন কমিশনকে লাগানো হচ্ছে। এর সঙ্গে জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের কোনও সম্পর্ক নেই।

উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার মিছিল

মামলা প্রতি বরাদ্দ সময় ২ থেকে ৫ মিনিট ন্যায়বিচার আদৌ সম্ভব?

ভারতের বিচারালয়ে বাস্তবে কতটুকু ন্যায়বিচার হয় তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা রিপোর্টে। সমীক্ষা বলছে কোর্টের বিচারকরা এমন পাহাড় প্রমাণ মামলার চাপে থাকেন যে, এক-একটা মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি শুনে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচ-ছয় মিনিটের বেশি সময় পান না।

জজ কোর্টের যে বিচারকদের উপর চাপ তুলনামূলকভাবে কম, তাঁরা একটি মামলার শুনানিতে কতটুকু সময় দিতে পারেন? ১৫-১৬ মিনিট। যাঁরা বেশি ব্যস্ত তাঁরা দিতে পারেন মাত্র আড়াই মিনিটের মতো। এবং এটা শুধু একটা কোর্টের চিত্র নয়, দেশের সব কোর্টের ক্ষেত্রেই সত্য।

কলকাতা হাইকোর্টের কথাই ধরা যাক। এখানে একজন বিচারকের সামনে দৈনিক গড়ে ১৬৩টি মামলার ফাইল জমা পড়ে। সময় বরাদ্দ মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। অর্থাৎ একটি মামলার জন্য বরাদ্দ মাত্র দুই মিনিট। পাটনা, হায়দরাবাদ, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান হাইকোর্টের ক্ষেত্রে মামলা পিছু সময় ২-৩ মিনিট। ৪ থেকে ৬ মিনিট সময় দিতে পারেন এলাহাবাদ, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশা হাইকোর্টের বিচারকরা। অর্থাৎ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে বিচারপতিরা মামলা পিছু গড়ে পাঁচ-ছয় মিনিটের বেশি সময় দিতে পারছেন না।

এই তথ্য উঠে এসেছে ২১টি হাইকোর্টের ১৯ লাখ মামলা এবং ৯৫ লাখ শুনানির বিশ্লেষণ থেকে। ‘দক্ষ’ নামে বেঙ্গালুরুর এক অসরকারি সংস্থা ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে এই চাঞ্চল্যকর বক্তব্য পেশ করেছেন।

কেন এই অবস্থা? কারণ, পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিচারক নিয়োগ করছে না সরকার। অল ইন্ডিয়া জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের এক মামলায় ২০০২ সালের ২১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচারক ও জনসংখ্যা অনুপাত সংক্রান্ত এক রায়ে বলেছে, দশ লক্ষ নাগরিক প্রতি ন্যূনতম ৫০ জন বিচারক থাকতে হবে। বাস্তবে রয়েছে কত? ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট বলছে, দশ লক্ষ নাগরিক প্রতি বিচারক রয়েছেন মাত্র ১৬.৮ জন। তা হলে সঠিক বিচার হবে কী করে?

একটি বহুল প্রচলিত কথা—‘বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর’। বিচার বিলম্বিত হয় বা বিচারে কম সময় দেওয়া হয় বিচারকের অভাবে। সরকার কেন বিচারপতি নিয়োগে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না? দেশে কি বিচারপতি হওয়ার মতো লোকের অভাব? লক্ষ লক্ষ আইনজীবী দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে ওকালতি করে চলেছেন। তাঁদের থেকে কি বিচারপতি নিয়োগ করা যেত না? সরকার নিয়োগ করেনি কেন? কেন জনগণকে বিচার নিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে ফেলা হচ্ছে? উত্তর সেই একই— জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধ-কর্তব্যবোধের অভাব। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতোই কোর্টগুলিতেও বিপুল সংখ্যক বিচারকের পদ খালি। ফলে কর্মসংস্কৃতি কথাটি নামেই। সরকারি দপ্তরগুলিতে যেমন মানুষের নিত্য হয়রানি, কোর্টেও তেমনি। মামলায় ডেটের পর ডেট পড়ে, বিচার হয় না। সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, হাইকোর্টের ক্ষেত্রে মামলা শুরুর পর বিচার শেষ হতে কম করে ১,১৪১ দিন সময় নেয়, জেলার কোর্টগুলি সময় নেয় ২,১৮৪ দিন। বাস্তবে নিম্ন কোর্টে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিচার শেষ হতে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। ন্যায়ালয় এভাবেই হয়ে ওঠে যাতনালয়। বছরের পর বছর মামলা চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় বহু পরিবার। তার পরেও একটি মামলার যুক্তি, প্রতিযুক্তি শোনার মতো সময় বিচারকের হাতে থাকে না। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

কাশ্মীরে স্কুলছাত্রীর শ্লীলতাহানি

নিজেদের অপরাধ ঢাকতে গুলি করে হত্যা সেনাবাহিনীর

অভিযোগ উঠেছে ১২ এপ্রিল কাশ্মীরের হান্দওয়াড়ায় এক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে এক সেনা জওয়ান। মানুষ অবশ্যই আশা করতে পারে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সঠিক তদন্ত হবে এবং সরকার ও সেনাবাহিনী কাউকে আড়াল করার চেষ্টা না করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হবে। জনগণের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলে আধপেটা খাওয়া জনসাধারণের ট্যাক্সের পয়সায় গড়ে ওঠা সরকারি কোষাগারের সিংহভাগ যাদের পিছনে ব্যয় হয়, সেই সেনা জওয়ানরা এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলে সরকার তা সহ্য করবে না, এটাই যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে হওয়ার কথা। কিন্তু কী দাঁড়ালো? ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষ হান্দওয়াড়ার মেন স্কোয়ারে জমা হওয়া মাত্র নির্বিচারে গুলি চালালো সেনাবাহিনী। ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন তিনজন। তাদের একজন কাশ্মীরের অনূর্ধ্ব উনিশ ক্রিকেটে রাজ্য দলের খেলোয়াড় নইম কাদির ভাটের মতো তরতাজা কিশোর, আর একজন মহিলা যিনি তাঁর বাড়ির লাগোয়া সবজি বাগানে কাজ করছিলেন, বিক্ষোভের সাথে তাঁর কোনও সম্পর্কই ছিল না। পরবর্তী দু'দিনে দ্রুগমুল্লা এবং কুপওয়ারাতে এই গুলি চালানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভে একই ভাবে অত্যাচার চলেছে। দুই জায়গাতেই এক একাদশ শ্রেণির ছাত্র সহ দু'জনের প্রাণ গেছে।

কেন এমন ঘটতে পারল? কারণ রাজ্যটার নাম কাশ্মীর, যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের অজুহাতে সেনাবাহিনীর হাতে যথেচ্ছ গুলি চালানোর অধিকার দেওয়া আছে আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা)-র মাধ্যমে। কিন্তু সেনাবাহিনী যাদের হত্যা করল তারা কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী এমন কথা সেনা কম্যান্ডাররাও বলতে পারছেন না। কাশ্মীরে এখন ক্ষমতায় বিজেপি-পিডিপি জোট সরকার। দেশাত্মবোধের স্বঘোষিত মালিক বিজেপিও এই ক্ষেত্রে নিহতদের গায়ে দেশবিরোধী তকমা লাগাতে ব্যর্থ।

নইমের স্বপ্নই ছিল ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলার। ক্রিকেটও যেহেতু এখন বিজেপির উগ্র জাতীয়তা প্রচারের একটি হাতিয়ার, ফলে তাকে দেশবিরোধী বলা বিজেপির পক্ষেও মুশকিল। সেনাবাহিনী কাশ্মীরের নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর কালা আইন আফস্পার বলে কী সাংঘাতিক নির্যাতন করে চলেছে তা এর আগেও বহু ঘটনায় সামনে এসেছে। ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনায় নিরীহ মানুষকে হত্যা, টাকা আদায়ের জন্য সন্ত্রাসবাদী তকমা গায়ে লাগিয়ে দিয়ে নির্দোষ যুবকদের নির্যাতন করা, যখন তখন সাধারণ মানুষকে সেনা ছাউনিতে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন এবং মিথ্যা জবানবন্দিতে জোর করে সই করিয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো—যাতে সেনাবাহিনী সন্ত্রাস দমনে কত সক্রিয় তা প্রমাণ করা যায়। এ সব জিনিস আকছার ঘটছে। অথচ সেনার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই কিছু সংবাদমাধ্যম এবং বিজেপি, আরএসএস, কংগ্রেসের মতো দলগুলি প্রতিবাদীদের দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে দেয়। কংগ্রেস এবং তার ইউপিএ-র শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরে গদিতে থাকার সময় একইভাবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের উপর দমন পীড়ন চালিয়েছে। এই পথেই আফস্পা-র মতো স্বৈরতান্ত্রিক আইন কাশ্মীর, মণিপুর সহ কয়েকটি রাজ্যে চাপিয়ে রাখতে পেরেছে সরকার।

কিন্তু এই ঘটনায় বেপরোয়া সেনা এবং নির্লজ্জ বিজেপি-পিডিপি জোট ও কংগ্রেসের মিথ্যাচারের মুখোশ পুরোপুরি খুলে গেছে। শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঢাকতে সেনবাহিনী প্রথমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল, যাতে মেয়েটিকে বলতে শোনা গিয়েছিল সেনা জওয়ানরা নয় স্থানীয় কিছু ছেলেই স্কুল থেকে ফেরার পথে একটি সাধারণ শৌচালয়ে তার শ্লীলতাহানি করেছে। কিন্তু মেয়েটির মা অভিযোগ করেছেন, ঘটনার পরেই নাবালিকা মেয়েটিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে তুলে নিয়ে যায়, সেনা ছাউনি বা থানায় বসিয়ে জোর করে তাকে দিয়ে এই জবানবন্দি দেওয়ানো হয়েছে। পাঁচদিন ধরে মেয়েটিকে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো দূরে থাক পরিবারের সাথেও তাকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। তার বাবা এবং কাকিমাকেও পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। একজন নির্যাতিতাকে কেন আটকে রাখা হয়েছে ও তার বয়ান কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেন রেকর্ড করা হয়নি তা নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট পর্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আইনজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন একজন নির্যাতিতার সামাজিক সম্মানহানির আশঙ্কায় তার নাম কখনওই সরকার প্রকাশ্যে জানায় না। অথচ এই মেয়েটির ভিডিও ছবি ও বয়ান সেনাবাহিনী প্রচার করল কী করে? যে কোনও গুলি বা লাঠি চালানোর ঘটনায় যে সাফাই নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও বিক্ষোভকারীদের ছোঁড়া ইটের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালানোর সেই অজুহাত সেনাবাহিনী দিয়েছিল। কিন্তু কুপওয়ারা জেলার নাথনুসা সেনা ক্যাম্প, যেখানে ইট ছোঁড়ার অজুহাতে সেনাবাহিনী গুলি করে এক একাদশ শ্রেণির ছাত্রকে হত্যা করেছে, সেখানে তদন্তকারীরা কোনও ইটের টুকরোর হদিস পাননি। তাঁরা বলেছেন, সেনা ছাউনির দুই স্তরের কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে কোনও ইটের টুকরোর ভিতরে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ দিল্লি সহ নানা জায়গায় বিক্ষোভ সামলাতে কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, রাবার বুলেট ব্যবহার করে যাতে জীবনহানির ঘটনা এড়ানো যায়। কাশ্মীরের মানুষের জীবনের দাম কি এতই কম যে সেনাবাহিনী এটুকু ব্যবস্থাও করতে পারে না? নাকি আফস্পা আইনের সুযোগে এই হত্যালীলা চালিয়েই কাশ্মীরীদের দেশপ্রেম শেখাতে চায় বিজেপি-কংগ্রেস এবং তাদের দোসররা!

সেনাবাহিনীর এই আচরণের জন্যই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কাশ্মীরে জমি পাচ্ছে আরও বেশি বেশি করে। সাধারণ কাশ্মীরী জনগণ, যাঁরা কোনও ভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদকে এবং পাকিস্তানপন্থী বা অন্য সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করেন না, তাঁদের মনেও এই প্রশ্ন উঠছে যে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার এবং সেনাবাহিনী তাঁদের দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য করা দূরে থাক, মানুষ বলেই মনে করে কি না। এই পরিস্থিতিতে বহু সাধারণ যুবক সেনাবাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হয়ে কোনও সুরাহা না পেয়ে শুধু রাগের বশে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করছেন। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সভ্য গণতান্ত্রিক দেশের সরকার যে সহানুভূতি ও ধৈর্য নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তা আশা করাই বৃথা। তাদের সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির কৌশলই হল কাশ্মীরী মাত্রেই সন্ত্রাসবাদী দাগা দিয়ে দেওয়া। সম্প্রতি জেএনইউ-এর ঘটনাতেও তা দেখা গেছে। তাতে বিজেপির পক্ষে দেশ জুড়ে হিন্দুত্বের উন্মাদনা তৈরিতে সুবিধা হয়। কংগ্রেসও একটু অন্য কৌশলে এই রাজনীতিই এতদিন চালিয়ে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কর্তব্য সমস্ত ধরনের উগ্রতা, মিথ্যা জাতীয় গরিমার মোহ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক চিন্তার পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ করা। এর মাধ্যমেই কাশ্মীরের নিপীড়িত শোষিত জনগণের সাথে ভারতের সমস্ত অংশের খেটে খাওয়া এবং একই রকমের শোষিত মানুষের মেলবন্ধন ঘটতে পারে। এই পথেই কাশ্মীর সহ অন্যান্য জায়গার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকেও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব। পুলিশ-মিলিটারির শক্তি দিয়ে যে কাজ কোনও দিনই সম্ভব নয়।

মার্কিন যুদ্ধবিমানকে এ দেশে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি

এ আই এ আই এফ-এর প্রতিবাদ

জ্বালানি ভরা, মেরামতি ইত্যাদির জন্য মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলিকে এদেশের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ভারত০ সরকার নিয়েছে, এ আই এ আই এফ-এর সহ সভাপতি মানিক মুখার্জী ১৪ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে বিশ্বজুড়ে সংকুচিত বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অংশীদারিত্ব বজায় রাখা এবং নিজের আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে মহাশক্তিধার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশীয় অঞ্চলের উপর নিজের সামরিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে চাইছে। ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা ভারতের লক্ষ্য হল, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠা। এই অঞ্চলে পুঁজিবাদী চীনের প্রভাব বাড়তে থাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সামরিক পরিকল্পনার অংশীদার হয়েছে ভারত। বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই অঞ্চলে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে এই দুই শক্তি।

দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশের এই চুক্তি দুটি দেশেরই কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী এবং জনস্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার এবং ভারত-মার্কিন সামরিক বোঝাপড়ার প্রতিবাদ করে সমস্ত জনবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবাহী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায় এ আই এ আই এফ।

ভোটের টুকিটাকি

অভিভাবক

কলকাতা হাইকোর্টের পাশে কিরণশংকর রায় রোডে প্রচার করার সময় এস ইউ সি আই (সি) স্বেচ্ছাসেবকরা একপ্রস্থ তিরস্কারের সামনে পড়লেন— কেন বিদ্যাসাগর কলেজের আশেপাশে এখনও ভাল করে জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ বিজ্ঞান বেরার পোস্টার, দেওয়াল লিখন হয়নি? প্রথমটা একটু চমকে গেলেও স্বেচ্ছাসেবকরা অভিভূত। সাধারণ মানুষ এভাবে পার্টির ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবছেন? 'আমি তো ছেলেকে বলি এই পার্টিটা না থাকলে তোর ভবিষ্যৎটাই অন্ধকার হয়ে যেত, ইংরেজি শিখতেই পারতিস না।' একদা সিপিএম সমর্থক মানুষটি এলাকায় এস ইউ সি আই (সি)-র প্রচার নিয়ে তাই এত উদ্বিগ্ন। মানুষই যে বিপ্লবী কর্মীদের যথার্থ অভিভাবক।

গর্বিত

কলকাতা হাইকোর্টের সামনের ফুটপাথে থমকে দাঁড়ালেন খ্যাতনামা এক বর্ষীয়ান আইনজীবী। দলের এক কর্মী তাঁকে লিফলেট দিয়ে নির্বাচনী তহবিলে সাহায্য চেয়েছেন। পেশায় চিকিৎসক সেই কর্মীই কিছুদিন আগে ওই আইনজীবীর স্ত্রীকে সারিয়ে তুলেছেন। তিনি অবাক 'ডাক্তারবাবু আপনিও রাস্তায় নেমে টাকা তুলছেন'? হাসলেন চিকিৎসক, 'নামব না কেন? অন্য দল যখন কর্পোরেট কোম্পানি আর বড় বড় ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভোটে লড়ে, আমরা জনগণের পাশে থেকে তাদের কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা চাঁদা চেয়ে তহবিল জোগাড় করি। এটাই তো আমাদের গর্ব আমরা টাকার কাছে মাথা বিক্রি করিনি।' 'এত বড় একটা কাজে রাস্তায় নামাটাই তো সম্মানের, ঠুনকো প্রেস্টিজ আমাদের দলের কর্মীদের যাতে না থাকে সেটাই আমরা দেখি'। বর্ষীয়ান আইনজীবী বলে গেলেন, 'বাড়িতে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন, যতটা বেশি পারি সাহায্য করব'।

যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড শ্যামল গুহমজুমদারের সমর্থনে সি পি আই এম এল-লিবারেশনের সাথে যৌথ প্রচার মিছিল

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে কমিশনকে চিঠি বুদ্ধিজীবীদের

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে স্মারকলিপি দিল শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। ১৫ এপ্রিল পাঠানো ওই স্মারকপত্রে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল এবং যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি এবং আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো সত্ত্বেও প্রথম দুই দিনের নির্বাচনে সন্ত্রাস, বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের মারধর, ভোটকর্মীদের হেনস্থা ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী চিন্তার মানুষদের ভোটাধিকার প্রয়োগে যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে, শাসকদলের গুন্ডারা যেভাবে হুমকি, ধমকি, শারীরিক আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে 'আইনের শাসন', 'পুলিশের ভূমিকা', 'প্রশাসনের ভূমিকা' ইত্যাদি কথাগুলি উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় গণতন্ত্র এবং জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় কমিশনের কঠোর ভূমিকা দাবি করেছে বুদ্ধিজীবী মঞ্চ।

জয়নগরে মানুষের পাশে অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর

জয়নগরে যানজট নিরসনে কুলপী রোডের বাইপাস, ব্লক হাসপাতালগুলিকে জেলা হাসপাতালে উন্নয়ন, চাষিদের জন্য প্রতিটি ব্লকে হিমঘর স্থাপন, জয়নগরে ফায়ার ব্রিগেড ও সাধারণ ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা, সমস্ত মানুষের রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা ঠিকমতো দেওয়ার দাবি সহ স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন এবং নিমপীঠে আই টি আই কলেজ স্থাপন, কুলপী রোডে বাস চলাচল শুরু, মথুরাপুর পর্যন্ত ডবল লাইন চালু, ৪টি নতুন ট্রেন, টিকিট কাউন্টার চালুর দাবি আদায় করেছেন। বিধানসভার অভ্যন্তরেও এই দাবিগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। বিধানসভায় তাঁকে যে সীমিত সময় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেও তিনি ৪৫০-এরও বেশি বার বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। পূর্বতন সিপিএম সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান তৃণমূল সরকার কর্তৃক অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণ করে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, গণআন্দোলনের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিদ্যুতের বারবার অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি, মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া, মা-বোনেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, আইন শৃঙ্খলার অবনতি সহ নানা সমস্যা ও জনবিরোধী আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে তিনি বিধানসভার অভ্যন্তরে সোচ্চার হয়েছেন। বিধানসভার শিক্ষার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। স্কুল-কলেজের আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিধানসভার বাইরেও প্রতিটি গণআন্দোলনে তিনি সামনের সারিতে থেকেছেন। শিয়ালদহ লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় ১২ বগির ট্রেন চালু ও ডবল লাইনের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি দাবি আদায় করেছেন। তিনিই একমাত্র বিধায়ক, যিনি বিধানসভায় বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবকে দলের শিক্ষা অনুযায়ী তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বর্ধিত ভাতা নিজে গ্রহণ না করে সেই টাকায় জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত কৃতী ২১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে গত ৪ বছর ধরে বৃত্তি দিয়েছেন। তাঁর এই ভূমিকার জন্য সংবাদমাধ্যম গোটা দেশের মধ্যে 'ব্যতিক্রমী বিধায়ক' হিসাবে তাঁকে ভূষিত করেছে।

জয়নগর কেন্দ্রের পদ্মেরহাটে প্রচার মিছিলে কমরেড তরুণ নস্কর

২৪ এপ্রিল
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর
৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস
পালন করুন

বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড অজয় সাহাকে হুমকি চিঠি

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৩ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থী কমরেড অজয় সাহাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়ে ও তৃণমূলে যোগ দিলে প্রচুর টাকা ও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ১৩ এপ্রিল তাঁর বাড়ির ঠিকানায় ডাকযোগে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে জয়নগর থানার এস আই ইন্দ্রজিৎ ভকতের নাম করে। চিঠিটি ইংরেজিতে টাইপ করা এবং স্বাক্ষরবিহীন। লেখক তৃণমূলের পক্ষ থেকে লিখছেন বলে জানিয়েছেন। চিঠিতে কোনও এক নির্মলবাবুর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যারা তৃণমূলে যোগ দেবে তাদেরই তিনি নানা ভাবে পুরস্কৃত করবেন। এই নির্মলবাবুই যে ইন্দ্রজিৎ ভকতকে চিঠি লিখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তার উল্লেখও চিঠিতে আছে। এই নির্দেশ না মানলে নির্বাচনের পর ভয়াবহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে বলে চিঠিতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। সব শেষে বিষয়টি গোপন রাখতে ও নির্বাচন কমিশনে না জানাতে হুমকি সহ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রার্থী অজয় সাহা চিঠি পাওয়ামাত্রই নির্বাচন কমিশনে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আমরা এই ধরনের কাপুরুষোচিত হুমকি ও প্রলোভন দেখানোর চেষ্টার তীব্র নিন্দা করছি। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

এম বি বি এস এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে আসন কমানোয় প্রতিবাদ ডি এস ও-র

সম্প্রতি এ রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে পরিকাঠামোর অভাব-জনিত কারণে এম বি বি এস এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে যে ব্যাপক সংখ্যক আসন সংকোচনের সিদ্ধান্ত এম সি আই নিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এ আই ডি এস ও মেডিকেল ইউনিট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে না পারলে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ৯৫টি সহ গোটা রাজ্যের প্রায় পাঁচশো আসন এম সি আই বাতিল করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এ ছাড়াও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্সগুলিতেও ইতিমধ্যেই ব্যাপক সংখ্যক আসন সংকোচন করা হয়েছে। উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কারণেই এই ঘটনা ঘটল। এর প্রতিবাদে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার (ডি এম ই) কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, ভোটের বাজারে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঘোষণা না করে মেডিকেল কলেজগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে সরকারকে বেশি নজর দিতে হবে।

মধ্যপ্রদেশে ১ লাখ স্কুল বেসরকারিকরণ করছে বিজেপি সরকার

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ১ লাখ ৮ হাজার সরকারি স্কুল প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের নামে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে শিক্ষা হয়ে উঠবে বেসরকারি মালিকদের হাতে মুনাফার লোভনীয় পণ্য, সাধারণ মানুষ হারাবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষার অধিকার। এর বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ৭ এপ্রিল ভোপাল, গোয়ালিয়র, গুনা, অশোকনগর, সাগর প্রভৃতি জেলা থেকে আগত শত শত ছাত্রছাত্রী আবারও বিক্ষোভ দেখাল নীলম পার্কে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মুদিত ভাটনগর ছাড়াও বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস বিনোদ লোগারিয়া, অজিত সিং, ববিতা সমর, শ্রুতি শিবহরে, পারুল শর্মা, নিবেদিতা খাতরকর। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সচিন জৈন। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত প্রতিবাদপত্র মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পেশ করা হয়। (ছবি প্রথম পাতায়)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org